Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিতু আক্তার

রোলঃ 23090120023

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিতু আক্তার

রোলঃ 23090120023

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নিতু আক্তার, আইডিঃ 23090120023 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত কুরআন ও হাদিসের আলোকে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Nitu Akter

(স্বাক্ষর)

নিতু আক্তার

আইডিঃ 23090120023

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5

সুখ শান্তির সংজ্ঞা ও ধারণা গত বিশ্লেষণ :.....7

ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞানে সুখ ও মানসিক প্রশান্তি (শান্তি).....11

কুরআনের আলোকে প্রকৃত সুখ শান্তি.....13

হাদিসের আলোকে প্রকৃত সুখ শান্তি.....25

বাস্তব জীবনে প্রয়োগ.....31

আধুনিক সমাজে সুখের চ্যালেঞ্জ.....36

ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক শান্তি.....38

উপসংহার.....39

ভূমিকা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মহান আল্লাহ তায়ালার সকল সৌন্দর্য বহনকারী সৃষ্টির মধ্যে অপরূপ এক সৃষ্টি হচ্ছে "মানুষ"। সুবহানাল্লাহ! এই মানুষকেই সৃষ্টির সেরা জীব বা "আশরাফুল মাখলুকাত" হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

" অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।"

(সুরা আত-ত্বীন, আয়াত ৯৫ : ৪)

তবে মানুষের এই সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক নয়; বরং এতে নিহিত রয়েছে বুদ্ধি, বিবেক, আত্মার বিশুদ্ধতা ও আত্মিক সৌন্দর্য। কিন্তু আমরা আশরাফুল মাখলুকাতেরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, মহান আল্লাহ তায়ালার আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুনিয়াবি অর্জন নয় বরং স্রষ্টার সন্তুষ্টি, আত্মিক প্রশান্তি এবং পরকালীন জীবনের সফলতা লাভ করা।

মূলত এইসব কারনেই মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করে অন্যান্য সৃষ্টির ওপর মর্যাদাবান করেছেন, যাতে সে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে। মানুষের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা তখনই অর্থবহ হয়, যখন সে স্রষ্টার নির্দেশিত পথে চলে এবং অন্তরের প্রশান্তি অর্জন করে। কেননা, প্রশান্তিহীন জীবন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে পূর্ণ হলেও তা বিষক্রিয়ার মতো বিষাক্ত ও নিরর্থক।

প্রকৃত সুখ ও শান্তি জীবনের কোনো বাহ্যিক অর্জনের বিষয় নয়; বরং এটি মানুষের অন্তর, আত্মা ও ঈমানের অবস্থার নির্ভরশীল। ইতিহাসের সূচনা থেকেই মানুষ এই সুখ ও শান্তির অনুসন্ধানে ব্যস্ত। কেউ এই প্রশান্তি খোঁজে অর্থে, কেউ খ্যাতিতে, কেউ ভোগে, আবার কেউ জাগতিক সাফল্যে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।

বস্তুগত অর্জন, যা আখিরাতমুখী নয়, তা মানুষকে কখনো স্থায়ী শান্তি দিতে পারে না; বরং উদ্বেগ, প্রতিযোগিতা ও হতাশাই হয়ে ওঠে মানুষের নিত্যসঙ্গী।
তাহলে প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসলে কোথায়? পবিত্র কোরআন এ বিষয়ে ঘোষণা দেয় :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ؕ
اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

“যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সূরা রা‘দ, আয়াত ১৩ : ২৮)

পবিত্র এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত সুখ ও শান্তির মূল উৎস হলো ঈমান, তাকওয়া, আল্লাহর স্মরণ ও আখিরাত নির্ভর জীবনযাপন।

এই গবেষণায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে “প্রকৃত সুখ শান্তির” ধারণা, এর উৎস ও এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহমুখী জীবনদৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ কীভাবে সত্যিকারের আত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে তা উদঘাটন করা।

সুখ শান্তির সংজ্ঞা ও ধারণা গত বিশ্লেষণ :

“সুখ” ও “শান্তি” এই দুটি শব্দ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও ধারণাগত দিক থেকে সম্পূর্ণ এক নয়। সাধারণভাবে উভয়ই ইতিবাচক মানসিক অবস্থাকে নির্দেশ করে, তাই অনেক সময় এগুলোকে সমার্থক বলে মনে করা হয়। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এদের উৎস, প্রকৃতি, স্থায়িত্ব এবং মানসিক-সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

১. সুখ (سعادة) : সংজ্ঞা ও ধারণা

আরবি سعادة (সা‘আদাহ) শব্দটি সাধারণত আনন্দ, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও প্রাপ্তির অনুভূতিকে নির্দেশ করে। ধারণাগতভাবে “সুখ” এক ধরনের বাহ্যিক ও ক্ষণস্থায়ী আবেগগত অভিজ্ঞতা, যা প্রধানত বস্তুগত অর্জন, সাফল্য, উপভোগ বা সাময়িক আনন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থ, সম্পদ, খ্যাতি, আর্থিক উন্নতি, কাঙ্ক্ষিত কোনো দুনিয়াবি লক্ষ্য পূরণ ইত্যাদি মানবমনে আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা সাধারণত “সুখ” হিসেবে বিবেচিত হয়।

তবে এই সুখ টেকসই নয়; কারণ এর উৎস বস্তুনির্ভর ও পরিস্থিতি নির্ভর। ফলে কোনো ব্যক্তি দুনিয়াবী অর্জনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে নিজেকে সুখী মনে করতে পারে। এমনকি তার জীবনের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যরাও তাকে সুখী বলে অনুমান করতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক সুখ থাকা মানেই অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি বা শান্তির উপস্থিতি নিশ্চিত হয় না। সুখের এই অস্থায়ী প্রকৃতি প্রমাণ করে যে এটি মানুষের মানসিক জগতের একটি ক্ষণিক অনুভূতি, যার স্থায়িত্ব বাহ্যিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

মানবজীবনে সুখের উপস্থিতি অনেক সময় পরিলক্ষিত হলেও সেই সুখ সবসময় মানসিক প্রশান্তি এনে দেয় না। কারণ সুখ মূলত অর্জন, ভোগ, প্রত্যাশা পূরণ ও পরিবেশগত সুবিধার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একধরনের বহিঃপ্রকাশমূলক অনুভূতি। তাই দুনিয়াবী সাফল্যের কারণে মানুষ সামাজিকভাবে সফল বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু তার অন্তরে শান্তির অভাব থাকতে পারে। ফলে সুখ থাকলেও শান্তি নাও থাকতে পারে। এটি একটি মৌলিক বাস্তবতা। আসলে সুখী হলেই শান্তি থাকে না;কিন্তু যে শান্তিতে আছে সে অবশ্যই সুখে আছে এবং সে সুখী ও বটে।

মানুষ স্বভাবগতভাবে দুনিয়া ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সুখ, সাফল্য ও কল্যাণ প্রত্যাশা করে। তবে দুনিয়াবি সুখের পেছনে দুনিয়াবি অনেক অর্জন বা বিষয়ও জড়িত থাকে। যা কখনোই

প্রকৃত সুখ এনে দিতে সক্ষম নয়। জাগতিক জীবনের কাঠামো এমনই যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই; কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের সময়, শক্তি ও সম্পদ সবই সীমার ভেতরে আবদ্ধ। তাই যার আত্মনিয়ন্ত্রণ আছে, যে মানুষ সীমিত সামর্থ্যের মাঝেও নিজের চাহিদাকে সংযত রাখতে জানে। আর সুখ শেষ পর্যন্ত তার দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সীমিত এই জীবনে অসীম প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচে, তার জীবনে সন্তুষ্টির পরিবর্তে দুঃখ ও দুর্দশা এবং হতাশা। সে ক্রমাগত অস্থিরতা ও মানসিক ক্লান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হয়।

কেউ যদি দুনিয়াতে প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে চায়, তাহলে তাকে সুখী বা সুখে থাকার সে উপকরণকে খুঁজে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুনিয়াবী দিক বিবেচনায় অনেক জিনিস'ই উঠে আসবে। যার স্থায়িত্ব অনন্তকাল নয় বরং ক্ষানিক ক্ষণের জন্য। তবে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁজতে গেলে এর দারুন ও সহজ সমাধান সহজেই খোঁজে পাওয়া যায়।
আর তা হলো "কানাআত" অর্থাৎ অল্পে তুষ্টি। অল্পে সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ তায়ালা যা দিয়েছেন, সে সব জিনিসকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণকর ও উত্তম সিদ্ধান্ত মনে করে তাতে শুকরিয়া আদায় করা। এটি কেবল নৈতিক গুণ নয়, বরং মুমিনের চরিত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর মুমিনের তো এমন ই হওয়া উচিত।

অল্পে তুষ্টি মানে দুনিয়াতে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়া নয়, নিজের জীবন নিয়ে অসন্তিতে ভোগা নয় বরং উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে হতাশা বা বিষন্নতায় ডুবে না থেকে নিজের যা আছে তাতেই তুষ্ট থেকে প্রকৃত সুখের সন্ধান করা। যখন আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে, তখন দেখা যাবে ছোট্ট এই জীবনে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কিছু না পেলে হতাশা বা বিষন্নতা ঘায়েল করে বসবে। সে মুহূর্তে দ্বীন ও দুনিয়া কিছুই ভালো লাগবেনা।

তাই আমাদের সবাইকে দুনিয়া সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি করতে হবে। এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন এবং এই সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটতে ছুটতে এমন যেন না হয় যে আমাদের সময় শেষ। তাই দুনিয়ার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার কাজ।

কানাআতের বিপরীত হলো: লোভ-লালসা, মোহ ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। দুনিয়াবি বিভিন্ন জিনিসের প্রতি মানুষের লোভ লালসা ও মোহের যেনো কখনোই শেষ হয় না। এ যেন এক বিশাল প্রতিযোগিতা। দুনিয়াবি এই প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো হতে পারে নানা ধরনের যেমন : অঢেল অর্থ উপার্জনের লালসা, বেশি সম্পদ অর্জনের ব্যাকুলতা,সামাজিক মর্যাদা বা বিলাসিতা অর্জনের প্রতিযোগিতা, অন্যের থেকে নিজেকে সবসময় আকর্ষণীয় বা বড় করে দেখা থেকে শুরু করে আরো বৈচিত্র্যময় জিনিস সমূহের প্রতিযোগিতা। এই জিনিসগুলোই মানুষের জীবনের

অনেক বড় ক্ষতি সাধন করে বসে অর্থাৎ মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক প্রশান্তিই নষ্ট করে দেয়। কেননা, এগুলো সবই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগবস্তু।

তাই ইমান, আমল, আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইসলামে যাবতীয় বিধি-বিধান মান্য এবং কানাআতের মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত সুখের সন্ধান করতে হবে। যার স্থায়িত্ব এই দুনিয়া হতে পরকাল অব্দি থাকবে। তবে দুনিয়া যেহেতু একটা পরীক্ষা কেন্দ্র তাই এই ইহকালীন জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবেই; তাতে মুমিনরা কখনই হতাশ হবে না বরং এতেও কল্যাণের সন্ধান করবে এবং আল্লাহর কাছে এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজবে।

২. শান্তি (সংজ্ঞা ও ধারণা)

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ হতে "শান্তি" এর আরবি হলো সাকিনাহ (سكن)। শান্তি এমন এক প্রশান্তির বিষয় যা মানসিক ভারসাম্য ও অন্তরের তৃপ্তির সাথে যুক্ত। ইসলামিক পরিভাষায়, শান্তি বিষয়টা পুরোটাই মানুষের অভ্যন্তরীণ একটা বিষয়। যা কেবল একজন ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে পারেন। এই বাহ্যিক আর অভ্যন্তরীণ এই দুই শব্দের মাধ্যমেই "সুখ ও শান্তির" পার্থক্য খুব সহজেই বোঝা যায়। শান্তি বা "সাকিনাহ" হচ্ছে এমন এক অবস্থা যেখানে বান্দা তার স্রষ্টার সঙ্গে এক গভীর আত্মিক সংযোগ অনুভব করে। এমনকি দুনিয়ার সব দুঃখ ও ভয়কে একজন মুমিন জয় করে ফেলে এই প্রকৃত আত্মিক শান্তির মাধ্যমে।
ইসলাম শব্দটি এসেছে আরবি শব্দমূল 'সিলম' থেকে, যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা এবং আনুগত্য। আর ইসলাম যা বহন করে এবং সেগুলোর মাধ্যমে যে শান্তি প্রদান করে, তা আমাদের জীবনে ধারণ করতে হলে এইসব আন্তরিকতার সহিত পালন করতে হবে। এতে করে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে জীবন উপকৃত হব, তেমনি প্রকৃত শান্তি আসলে কেমন হয়ে থাকে তা আস্বাদন করতে পারবো।

আমাদের ইসলাম পরিপূর্ণরূপে একটি শান্তির ধর্ম। ইসলাম সবকিছুতেই শান্তি বহন করে। এর যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলেই শান্তি। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা সকল কাজেই শান্তি মিশ্রিত থাকে। যেমন: স্বলাতে প্রশান্তি, তাওহীদে শান্তি, অন্যকে শান্তিতে রাখার মধ্যেও শান্তি, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবর বা ধর্য্য ধরার মধ্যেও শান্তি।

মুমিনের জীবনে সুখ ও শান্তির পাশাপাশি দুঃখ-কষ্টের আগমন ও ঘটবে। তবে মুমিন এতে হতাশ হবে না। বরং সে তার ঈমানী জোরে তার প্রতিপালকের আরো কাছাকাছি হবে ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে। আমি তার জীবনের যে দুঃখ কষ্ট দেখা দিবে তাও তার প্রতিপালকের

রহমতেই বিদায় নিবে। তার রবের সাথে তার ঘনিষ্ঠতার জন্য সে দুঃখ কষ্টও আর পেরে উঠবে না। সুবহানাল্লাহ!

মূলত ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরে , ইসলামিক বিধান মাফিক জীবন পরিচালনার মধ্যেই শান্তির মূল শিকড় নিহিত।

ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞানে সুখ ও মানসিক প্রশান্তি (শান্তি)

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সুখ, শান্তি ও মানসিক তৃপ্তির অনুসন্ধানী। বর্তমানে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে এবং গবেষণায় দেখা গেছে, ইসলামী অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিকভাবে সুখের হরমোনের উৎপাদনের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয়; সুখের হরমোন কী?

আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানে দেখা যায়, আমাদের সুখানুভূতি প্রধানত চারটি হরমোনের উপর নির্ভরশীল: ডোপামিন, সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন এবং এন্ডোরফিন। তেমনি ইসলামও মানুষের অন্তর শান্ত রাখার জন্য ইবাদত, নৈতিক আচরণ এবং সামাজিক সদাচারের ওপর গুরুত্ব দেয়। ডোপামিন হলো একটি নিউরোট্রান্সমিটার, যা মস্তিষ্কে প্রেরণা এবং চলাফেরার সঙ্গে সম্পর্কিত স্নায়ুপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। ডোপামিন মস্তিষ্কে আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে।
নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা এবং পরিবার ও সমাজে সদাচরণ এসব কাজ ডোপামিন নিঃসরণ বাড়ায় এবং মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ
اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

“আল্লাহর স্মরণে অন্তর শান্তি পায়।” (সূরা রা‘দ, ১৩:২৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

“আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়।” (বুখারি, মুসলিম)
“দান করলে সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।” (মুসলিম)

এগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের (মনোবিজ্ঞান) সাথে সম্পর্কিত। কারণ দান, সাহায্য এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন অক্সিটোসিন ও ডোপামিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে, যা আনন্দ এবং মানসিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

নামাজ: মনোনিবেশ সহকারে নামাজ পড়া কর্টিসল হ্রাস করে এবং ডোপামিন বাড়ায়।

কুরআন তিলাওয়াত: ধীর ও সুষম তিলাওয়াত হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেরোটোনিন উৎপন্ন করে।
দান ও সদকা: মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সেন্টার সক্রিয় হয়, আনন্দ ও তৃপ্তি বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা: ইতিবাচক সামাজিক যোগাযোগ, হাসিমুখে কথা বলা এবং সালাম আদানপ্রদান সুখ হরমোন বৃদ্ধি করে।

তাই আমাদের প্রত্যেকেরই নিয়মিত জিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য সময় রাখা,প্রতিদিন অন্তত একটি সদাচারমূলক কাজ করা,প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে নামাজ ও ধ্যানকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ইতিবাচক ও মানসম্মত সময় কাটানো উচিত।

(পরিবর্তিত ধারণার উৎস: Farhad Khan, 2024)

কুরআনের আলোকে প্রকৃত সুখ শান্তি

মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সফলতা, সুখ ও প্রশান্তির জন্য যা প্রয়োজন, তার সবকিছুই কুরআন ও হাদিসে পরিপূর্ণভাবে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত শান্তি কোথায় এবং কীভাবে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে পথ দেখিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۙ

“যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।”
(সূরা রা‘দ : ২৮)।

এ আয়াতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে যে ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে—তাদের হৃদয়ে নেমে আসে প্রশান্তির আলো। দুনিয়ার নানা দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অশান্তির মাঝেও আল্লাহর স্মরণ হৃদয়কে শান্ত, স্থির ও শক্তিশালী করে তোলতে সক্ষম। আর এই অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, যা একজন মুমিনের জন্য অন্যতম বড় অর্জন ও জীবনের প্রকৃত সুখের উৎস।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনে আমি সংকীর্ণতা সৃষ্টি করব এবং কিয়ামতের দিনে তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।”
(সূরা ত্বহা, ২০:১২৪)

এই আয়াতটিতে 'সংকীর্ণতাময় জীবন' বলতে কবরের আযাব অথবা দুনিয়ার দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতাময় জীবনকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। যা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন যেকোনো ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। পবিত্র কুরআনের এই আয়াত’ই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর স্মরণেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি নিহিত। নতুবা জীবন হবে বিভীষিকাময়।

আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানেই প্রবল স্রোতে বৈঠা ছাড়া ও নিজের কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই এক বিপদগ্রস্ত মাঝি। যে গভীর সমুদ্রে তার কি ধরনের সমস্যা বা বিপদ হতে পারে তা জানা সত্ত্বেও সর্তক হয়নি। বরং নিজেকে ঠেলে দিয়েছে সমুদ্রের অতলে। তাইতো নিয়মিত স্বলাত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও জিকির এবং মানুষের হক আদায় থেকে শুরু করে ইসলামের যাবতীয় বিধান হৃদয়ে ধারন করার মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত সুখ ও শান্তি খোঁজে পাবো। যার স্থায়িত্ব এই ইহকালীন জীবন থেকে শুরু করে অনন্ত জীবন আখিরাত অব্দি। যার স্থায়িত্ব অনন্তকাল।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

“যে পুরুষ বা নারী সৎকর্ম করে, আর সে মুমিন হয় আমি তাকে দুনিয়ায় সুখময় জীবন দান করব এবং পরকালে উত্তম প্রতিদান দেব।”

(সূরা নাহল, ১৬:৯৭)

এই আয়াতটিতে “সুখময় জীবন” (حياة طيبة)-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাকওয়াবান ও নিষ্ঠাবানদের জন্য। কেননা আল্লাহভীতি, নৈতিকতা ও সত্যনিষ্ঠ জীবনই প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে। তাকওয়া ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়। যার স্থায়িত্ব ক্ষণস্থায়ী নয়। আর যে এইভাবে জীবন পরিচালনা করবে অবশ্যই সে একজন মুমিন। কেননা একজন প্রকৃত মুমিনের মধ্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য গুলো থাকে।

এই আয়াতটির সারমর্ম হল একজন চরিত্রবান মু'মিন সৎ ও ধর্মভীরু জীবন যাপনে, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও অল্পে তুষ্ট হওয়াতে যে পরম সুখ-স্বাদ অনুভব করে, তা কোন কাফের ,পাপী ব্যক্তি এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে এমন ব্যক্তি পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করলেও সে সুখ-স্বাদ ও শান্তি পায় না। বরং সে এক ধরনের মানসিক অশান্তি ভোগ করে। কেননা মহান আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে যে বিমুখ হবে, তার জীবন হবে বিষাদগ্রস্ত।

اَلَمْ تَرَ اِلَي الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓي اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰي ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর? অতঃপর তাদের উপর যখন লড়াই ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকালের অবকাশ দিলেন না’? বল, ‘দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না।”

(সুরা আন-নিসা ৪:৭৭)

এই আয়াত মানবজীবনের মানসিকতা, ঈমানের দৃঢ়তা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে। এতে দেখা যায়, অনেক মানুষ যখন পরীক্ষা বা কষ্টের মুখোমুখি হয়, তখন তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুবিধা ও স্বস্তির দিকে দৃষ্টি দেয়।

আল্লাহ স্পষ্টভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দুনিয়ার সুখ সামান্য এবং যে তাকওয়া ও ঈমানের ওপর স্থির থাকে। তার জন্য আখিরাতের সুখ ও পুরস্কার চিরস্থায়ী ও উৎকৃষ্ট। এই আয়াতের শিক্ষা অনুযায়ী, প্রকৃত শান্তি, স্থিতিশীলতা ও জীবনের সার্থকতা ঈমান ও তাকওয়ার মধ্যেই নিহিত।

মানুষ প্রায়ই দুনিয়াকে বড় মনে করে, কিন্তু আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন দুনিয়ার সুখ ক্ষণস্থায়ী, সামান্য এবং পরিবর্তনশীল। যখন যুদ্ধ ফরজ হয়, অনেকেই ভয় পায় এবং বলল, “হে আমাদের রব! কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলেন?” এই ভয় দেখায় যে তারা দুনিয়ার নিরাপত্তা, আরাম ও সাময়িক সুখকে অতিরিক্ত মূল্য দিচ্ছিল। আল্লাহ তাদের মনোযোগ সরিয়ে দেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি, ভয় ও উদ্বেগ সবই ক্ষুদ্র, কারণ এই পৃথিবীর সুখ কখনো স্থায়ী নয়; আজ শান্তি, কাল দুঃখ; আজ স্বাস্থ্য, কাল অসুস্থতা; আজ জীবন, কাল মৃত্যু।

আলেমরা বলেছেন, দুনিয়াকে সামান্য বলা হয়েছে কারণ এর সময় সীমিত, সুখ অসম্পূর্ণ এবং সবকিছু মৃত্যুতে শেষ। বিপরীতে, আখিরাত চিরস্থায়ী, পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান প্রদান করে এবং তাকওয়াবানদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যুদ্ধের এই ঘটনা আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কষ্টে হতাশ হওয়ার পরিবর্তে, চিরস্থায়ী সুখ, শান্তি ও আখিরাতের অনন্ত পুরস্কারের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

তাই আমাদের উচিত দুনিয়ার সাময়িক সুখে অথবা দুঃখে বিভ্রান্ত না হয়ে, আল্লাহর স্মরণ ও তাকওয়ার মাধ্যমে অন্তরের প্রকৃত শান্তি অর্জন করা।

কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

'আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো ফিতনা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আছে মহা পুরস্কার।'
(সুরা : আনফাল, আয়াত : ২৮)

আয়াতটিতে বলা হয়েছে, সন্তান ও সম্পদ মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা বা ফিতনা হিসেবে আসে। কিভাবে ?

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো কখনো কখনো মানুষের জন্য ভুল বা ভ্রান্তির পথে চলার কারণ হয়ে ওঠে। কারণ অতিরিক্ত ভালোবাসা বা আনুগত্যের অভাব মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবাধ্য এবং খিয়ানত করতে প্রলুব্ধ করতে পারে । অর্থাৎ, যখন কেউ নিজের সন্তান বা সম্পদকে আল্লাহর নির্দেশ ও নৈতিক দায়িত্বের চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করে, তখন সে সহজেই ঔদ্ধত্য, অহংকার বা অনুশাসনবিরোধী আচরণে লিপ্ত হতে পারে।

একারনে এখানে বলা হয়েছে , আল্লাহ এই ফিতনার মাধ্যমে মানুষকে যাচাই করেন। তাঁরা তাদের সন্তান ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কি না। যদি তারা আল্লাহর নির্দেশ ও ইসলামী নৈতিকতার সঙ্গে মিল রেখে এগুলো ব্যবহার করে, তাহলে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। অন্যথায়, যদি তারা নিজের লোভ, অহংকার বা অসততা দ্বারা সন্তান বা সম্পদকে অবাধ্যতার বা খিয়ানতের পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করে, তবে তারা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ও অসফল হিসেবে গণ্য হবে।

সন্তান ও সম্পদ মানুষের আনন্দের উৎস হলেও, তাদের দায়িত্ব ও আনুগত্য অবহেলার ক্ষেত্রে এগুলো শাস্তির কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই ইসলামে সতর্কীকরণ রয়েছে সম্পদ ও সন্তানকে ঠিকভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই প্রকৃত সুখ শান্তির পথ।

পবিত্র কুরআনে আরোও বলা হয়েছে :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۗ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তাকওয়া, যার মাধ্যমে তারা আখিরাতের মুক্তি লাভ করবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর অবশ্যই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই উত্তম; তবু কি তোমরা বোঝ না?'

(সুরা : ইউসুফ, আয়াত ১২ : ১০৯)

"তাকওয়া" শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর ভয়, সতর্কতা ও নৈতিক সচেতনতা। এই তাকওয়া যে বান্দার মধ্যে যত বেশি থাকবে সে তত বেশি সফল। কেননা যখন কোন বান্দার মধ্যে তাকওয়া থাকবে, তখন সে অবশ্যই একজন মুমিন বান্দা এবং তার এই তাকওয়া অর্জনই তাকে দুনিয়াবী বিভিন্ন পাপাচার , অপকর্ম এবং ইসলাম যা সমর্থন করেনা এমন কাজ থেকে দূরে রাখবে।

এসব বিষয় আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তি আরো উন্নত করবে। আর এভাবেই সে দুনিয়াবী ও আখিরাতে সফলতার দিকে ধাবিত হবে। আর যখন একজন ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকবে না বা তাকওয়া অবলম্বন না করলে সে কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হবে তা সম্পর্কে অবগত হবে না সে আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত। ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানেই।
তাকওয়া অবলম্বন না করে একজন ব্যক্তি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন :

১) আধ্যাত্মিক ক্ষতি

আধ্যাত্মিক ক্ষতি বলতে বুঝায়—একজন মানুষের অন্তর, আত্মা ও ধর্মীয় চেতনায় যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়। যখন মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপের পথে অগ্রসর হয়, তখন তার অন্তরের নূর ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে। পাপ আত্মাকে কলুষিত করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের প্রতি অনীহা তৈরি করে। এর ফলে সৎ কাজের তৌফিক কমে যায় এবং নৈতিক দৃঢ়তা দুর্বল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়ে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা ক্ষীণ হয়। আধ্যাত্মিক দূরত্ব বাড়ার কারণে মানুষ গোমরাহির দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে। সুতরাং আধ্যাত্মিক ক্ষতি মানুষের আত্মশুদ্ধির পথে এক বড় প্রতিবন্ধকতা।

২) নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি

নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি একটি সমাজের স্থিতি ও ভারসাম্য নষ্ট করে। যখন ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিকতা দুর্বল হয়, তখন তা পরিবার, প্রতিবেশী ও বৃহত্তর সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অসততা, প্রতারণা, অশ্লীলতা ও অবিচার স্বাভাবিক হয়ে গেলে সমাজে বিশ্বাস ও সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হয়। চরিত্রহীনতা ও নৈতিক অবক্ষয় সামাজিক মূল্যবোধকে ভেঙে দেয়, যার ফলে অপরাধ, দুর্নীতি ও বিভাজন বৃদ্ধি পায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে সামাজিক বন্ধন আলগা হয়ে পড়ে। অতএব, নৈতিক অধঃপতন সামগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশকে ধ্বংস করে দেয়।

৩) মানসিক ক্ষতি

মানসিক ক্ষতি হলো এমন একটি দিক, যা মানুষের অভ্যন্তরীণ স্থিতি ও মানসিক সুস্থতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পাপ ও নৈতিক বিচ্যুতি প্রথমে মানুষের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। কৃতকর্মের অপরাধবোধ, ভয় ও দ্বিধা মানসিক চাপকে বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং মন স্থায়ী দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে। দীর্ঘমেয়াদে এ ধরনের মানসিক চাপ উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ও মানসিক রোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। মানুষের মনোযোগ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো থেকে দূরত্ব তৈরি হয়। তাই মানসিক ক্ষতি ব্যক্তির সুস্থ জীবনযাপন ও আত্মিক প্রশান্তির ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৪) ইহকালে ক্ষতিগ্রস্ত

ইহকালের ক্ষতি বলতে দুনিয়ার জীবনে ব্যক্তি যে বিপর্যয়, অসুবিধা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়, তা বোঝায়। পাপাচরণ মানুষের সম্মান, সম্পদ ও সামাজিক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনৈতিক কাজের কারণে মানুষ পরিবার ও সমাজে বিশ্বাস হারায় এবং তার কর্মক্ষেত্রেও অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। দুনিয়ার রিজিকে বরকত কমে যায় এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অনৈতিক সিদ্ধান্ত ও ভুল পথ অনুসরণের ফলে আর্থিক ক্ষতি, সম্পর্কের ভাঙন এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো প্রতিকূলতা তৈরি হয়। সব মিলিয়ে ইহকালের ক্ষতি মানুষের পার্থিব জীবনে অস্থিরতা ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫) আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত

আখিরাতের ক্ষতি হলো মানুষের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ ও স্থায়ী পরিণতি। পাপাচরণের কারণে কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। মিজানে পাপের পাল্লা ভারী হলে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। কবরের আজাব, হাশরের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের শাস্তি পাপের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে অপেক্ষা করে। জান্নাতের অনন্ত শান্তি, নেয়ামত ও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া আখিরাতের সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এ ক্ষতি শুধু সাময়িক নয়; বরং এটি চিরস্থায়ী এবং অপূরণীয়। তাই আখিরাতের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

তাকওয়া অবলম্বন না করলে হৃদয়, মন, আচরণ ও সমাজ সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া আমরা ইতিমধ্যে অবগত আছি যে, "আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা এবং আখিরাতের সুখ শান্তিই প্রকৃত সুখ শান্তি।" তাকওয়ার ঘাটতি থাকার কারনে এইসবকিছু আমাদের থেকে হারিয়ে যায়।
তাকওয়া অবলম্বনে কয়েকটি কুরআনের আয়াত ও হাদিস :

وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ. فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ

আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে। নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।
(আন নাযিয়াত আয়াত: ৪০-৪১)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা বেশি আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।
আল হুজুরাত (আয়াত: ১৩)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ.الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

শোনো, তারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় ও মর্ম যাতনার অবকাশ নেই।

ইউনুস (আয়াত: ৬২-৬৩)

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে
আল-যুমার (আয়াত: ৭৩)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِي يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُون

আমার অনুগ্রহ সব জিনিসের ওপর পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। কাজেই আমি সেটা এমন লোকদের জন্য নির্ধরিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেবে এবং আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনবে
আল আ'রাফ (আয়াত: ১৫৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করার পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি -বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল
আল-আনফাল (আয়াত: ২৯)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ–ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন
আল ইমরান (আয়াত: ১৩৩-১৩৪)

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

তাহলে তুমি কি মনে করো , যে ব্যক্তি আল্লাহ ভীতি ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের উপর নিজের ইমারতের ভিত স্থাপন করলো সে ভাল, না যে ব্যক্তি তার ইমারতের ভিত উঠালো একটি গর্তের কিনারায় এবং তা তাকে নিয়ে সোজা জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়লো? এ ধরনের জালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না
আত তাওবাহ (আয়াত: ১০৯)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তাকে কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেন।
আত-তালাক (আয়াত: ২)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ

যারা তাদের রবকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান।
আল-মুলক (আয়াত: ১২)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন যেখানেই থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে; মন্দ কাজের অনুবর্তীতে কোন নেককাজ করে ফেলবে তাতে মন্দ অপসৃত হয়ে যাবে; মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করবে। (তিরমিযী, ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৯৯৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

আবদুল্লাহ (রা.) সুত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি এই বলে দু'আ করতেনঃ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা ও সচ্চলতার জন্য প্রার্থনা করছি। (মুসলিম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৬৫৬, তিরমিযী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৮৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي . قَالَ " عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ " . فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ " اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি বলল, এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি সফরের ইরাদা করছি, আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন আল্লাহ তাকওয়া আবলম্বন করবে। প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলবে। লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! তার জন্য দূরত্ব হ্রাস করে দিন এবং তার জন্য সফর সহজ করে দিন। (তিরমিযী,ইসলামিক ফাউন্ডেশন৩৪৪৫)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা আরোও বলেছেন,

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۡ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ

“আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয়, যা তোমাদের আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।”

(সুরা : সাবা, আয়াত ৩৪ : ৩৭)

মানুষের ধন-সম্পদ বা সামাজিক মর্যাদা আল্লাহর দেয়া হলেও এগুলো আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসা বা নৈকট্যের প্রমাণ নয়। মানুষের প্রকৃত সম্মান নির্ভর করে তার তাকওয়া, ঈমান ও সৎকর্মের উপর সম্পদ বা অবস্থানের উপর নয়।

প্রকৃত নৈকট্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ হলো ঈমান আনা ও নেক আমল করা। আর এই নেক আমলের মাধ্যমে আমরা পুরস্কৃত হবো বহুগুণ সওয়াব দিয়ে। আল্লাহ একটি নেকীর প্রতিদান কমপক্ষে দশ গুণ এবং সর্বাধিক সাতশ’ গুণ বৃদ্ধি করেন, আর প্রয়োজনে তার চেয়েও অনেক বেশি পুরস্কার দান করেন। তাই প্রকৃত সুখ, প্রশান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মানদণ্ড হলো সৎ অন্তর ও সৎ আমল, ধন-সম্পদ নয়। শুধু তাই নয়, সব চেয়ে বড় ওবিশেষ পুরস্কার , যার জন্য মূলত এই দুনিয়ায় আমরা পরীক্ষিত সে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে আমরা অবস্থান করতে পারব সুবহানাল্লাহ।

এই দুনিয়া হচ্ছে একটি কৃষিজমি এবং এই কৃষি জমির যত্ন ও পরিচর্যা করার জন্য আমরা মানব জাতিরা হচ্ছি কৃষক। যে যত যত্নশীল ভাবে তার কৃষি জমি যত্ন নিবে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে, সে ততো বেশি সফল হবে তার ফসল উৎপাদনে। ফসল রোপন করার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর তা কেটে ঘরে তোলা লাগে। যে কৃষক যত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তার জমির সঠিক পরিচর্যা করবে সে তত বেশী সফল হবে। তবে কোন কৃষক যদি সঠিক পরিচর্যা করার পরেও তার জমিতে আশানুরূপ ফসল না আসে সে যেন হতাশ না হয়। কেননা এটিও একটা পরীক্ষা।

এইখানে ফসল ধারা মানুষের আমলনামাকে বোঝানো হয়েছে। আর নির্দিষ্ট সময় ফসল কাটা বলতে , মানুষের হায়াত শেষ হয়ে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর তার হায়াত শেষ হওয়ার মাধ্যমেই সে দুনিয়াতে যে বীজ বপন করবে অর্থাৎ যে আমল করবে তা নিয়েই মহান রব্বুল আলামীনের কাছে হাজির হবে। কেননা এখানে এই কৃষিভূমির মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। মানুষ কেবল আমানতদার হিসেবে এই ভূমিতে কাজ করছে। তাই মানুষের কাজ হবে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলা, তাঁর বিধান মানা এবং নৈতিকতা ও ইখলাসের সঙ্গে আমল করা।

সঠিক পরিচর্যার পরও ভালো ফসল না আসায় হতাশ হতে না বলার মাধ্যমে মুমিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে। যে তার ধৈর্য ও সবরের কারণে ও আখিরাতে পুরস্কৃত হবে। আর এই ভালো ফসল (আমল) উৎপাদনের কারণে সে তার বিশেষ পুরস্কার আখিরাতে “জান্নাত” লাভের মাধ্যমে পুরস্কৃত হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۘ

আর দুনিয়ার জীবন তো শুধু খেলাধুলা ও বিভ্রম মাত্র; আর পরকালই প্রকৃত জীবন, যদি তোমরা জানতে।”
(সূরা আনকাবুত: ৬৪)

এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষার ক্ষেত্র বা ধোঁকা। যেখানে মানুষকে তার কর্মের মাধ্যমে নিজের আখিরাত গড়ে তুলতে হয়। যেমন একজন কৃষক তার জমিতে ফসল বপন করে যত্ন নেয়, আগাছা পরিষ্কার করে, পোকামাকড় থেকে ফসল রক্ষা করে ঠিক তেমনি মানুষকেও নিজের জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে। মানুষের অন্তর, চিন্তা, আচরণ সবই তার আখিরাতের ফসলের উপাদান।

এভাবেই মহান আল্লাহতালাকে সন্তুষ্টির মাধ্যমে সে নিজেও প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করবে। অতএব, দুনিয়ার জীবন আমাদের জন্য একটি ক্ষণস্থায়ী মৌসুম। কৃষকের ফসল রোপন ও ঘরে তোলার যেমন নির্দিষ্ট সময় আছে, আমাদেরও এই দুনিয়াবি জীবনে বসবাসের নির্দিষ্ট একটা সময় আছে। এই সময়ে যত আমল বপন করা হবে, আখিরাতে তারই সফল হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۚ

“যে ভালো কাজ করে, তা নিজের কল্যাণের জন্যই করে; আর যে মন্দ কাজ করে, তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে।”
(সূরা ফুসসিলাত: ৪৬)

সুতরাং প্রকৃত সুখ ও শান্তি তখনই অর্জিত হবে, যখন মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের কথা চিন্তা করে ভালো কাজ করবে। আর এর বিপরীতে সে যদি মন্দ কাজ করে তার ফলাফল ও সে নিজেই ভোগ করবে। তাই দুনিয়ার এই অস্থায়ী কৃষিভূমিকে আখিরাতের চিরস্থায়ী ফসলের প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে আমাদের ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে।

আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমল করলে, সে সকল পাপ যা আমাদের আমল নষ্ট করে দেয় তা থেকে দূরে থাকলে এবং ইখলাস ও ঈমানের সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করলে তখনই আমরা সফল কৃষক। যে দুনিয়ার মাঠে ভালো বীজ বপন করেছে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির জায়গা জান্নাতে সে তার সোনালী ফসল ঘরে তুলেছে। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গীগণ এবং তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব বিস্তৃত ঘন ছায়ায়”। [সূরা নিসা, আয়াত: ৫৭]

জান্নাতের সকল নিয়ামত ভোগ করতে হলে পরিপূর্ণ রূপে ঈমান এনে আমাদের জীবনকে উত্তম আমল ও আখলাক দিয়ে সাজাতে হবে।

হাদিসের আলোকে প্রকৃত সুখ শান্তি

আমাদের পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই রয়েছে প্রকৃত সুখ ও শান্তি (উভয় জাহান ইহকালীন ও পরকালীন)। ইতোমধ্যে আমরা এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সুখ ও শান্তির শুরু হয় একজন খাঁটি ও প্রকৃত মুমিন হিসেবে মৃত্যুবরণের পর।
হাদিসে এসেছে :

১) হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে—
নবী করীম (সাঃ) বলেছেন,

“যে আল্লাহর সঙ্গে (সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করেন। আর যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করে না, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করেন না।”
এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা: বলেন,
“হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা তো মৃত্যু চাই না।”
তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন,
“এটা কথা নয়। কথাটি হলো, যখন কোনো মুমিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন সে আনন্দিত হয়, তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে প্রিয় আর কিছু থাকে না, কেননা সে জানে, তার জন্য আল্লাহর সাক্ষাৎ অপেক্ষা করছে। আর যখন কোনো কাফিরের মৃত্যুর সময় আসে, তখন তাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অপছন্দনীয় আর কিছু থাকে না।
সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ চায় না, আর আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ চান না।”
(সহিহ বুখারী শরীফ)

এ হাদীসটিতে মুমিনদের জন্য দেওয়া হয়েছে "Infinity" পরিমাণ প্রশান্তির সংবাদ। যে শান্তির খবরের কাছে দুনিয়ায় কোন মুমিনের দুঃখে-কষ্টে কাতরাতে থাকা কিছুই নয়। সে সমস্যা যেনো সামান্য একটা ফুলের টোকা।
প্রকৃতপক্ষে মুমিন বান্দাদের জন্য দুনিয়ার দুঃখ থেকে শুরু করে পায়ে ফোঁটা একটা কাটার জন্যও রয়েছে অসংখ্য সওয়াব। যা তৎক্ষণাৎ কষ্টদায়ক হলেও সওয়াবের অংশীদার।

কেননা দুনিয়ায় ভোগ করা প্রতিটা কষ্টের জন্য সে আঁখিরাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে। শুধু তাই নয় উপরোক্ত হাদিসটিতে এটা স্পষ্ট যে, যখন কোন মুমিন বান্দার মৃত্যুর সংবাদ আসে , তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন সে আনন্দিত হয়, তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে প্রিয় আর কিছু থাকে না। কেননা সে জানে, তার জন্য আল্লাহর সাক্ষাৎ অপেক্ষা করছে। "সুবহানাল্লহ"।

এর চেয়ে উত্তম ও কল্যাণকর সংবাদ আর কি হতে পারে একজন মুমিনের জন্য? মৃত্যুর মতো জটিল ও কঠিন বিষয় আর কি হতে? এখানে সফল মানেই তো পরের গুলোতে সফলতা।

এখানেই তো আমাদের দুনিয়াবী জীবনের আসল সার্থকতা। যেখানে মূলত আমাদের পাঠানোই হয়েছে আল্লাহর বিধান মেনে জীবন যাপন পরিচালনার এবং দুনিয়ায় সামান্য কষ্ট ভোগ করলেও পরকালীন জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি লাভের জন্য। আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আমাদের এই দুনিয়াবী জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং তার'ই হুকুমে একদিন আমাদের দুনিয়াবী জীবনের ইতি টানতে হবে।

আমাদের এই দুনিয়াতে আগমনের মানে শুধু এটুকুই নয় যে; আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে জীবন পরিচালনা করব, যা খুশি তাই করব। আল্লাহতালার দেওয়া সকল নিয়ামত ভোগ করব, কিন্তু তিনি যে আমাদের কি উদ্দেশ্যে বা কি মিশনের জন্য দুনিয়ায় পাঠালো তা থেকেই আমরা নিজেদের গুটিয়ে রেখেছি। শুধু তাই নয় এমন ভাবে জীবন পরিচালনা করলাম যেন ভুলেই গেলাম আমরা একজন মুসলিম।
কতবড় বিপদজনক এই জিনিসটা আমরা কি আদৌ ভেবে দেখেছি? হঠাৎ যদি আজরাইল আমাদের নাফরমানি অবস্থাতেই আমাদের রুহ কবজ করে নেয়? তাহলে ব্যাপারটা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।

“ ক্ষনিকের সুখের আশায় আমরা মেহমান হয়ে আসা জায়গায়তেই আমাদের সব বিক্রি করে দিয়ে, আসল গন্তব্যের জন্য যেন কিছুই রাখলাম না”। এমনটা যেন না হয় আমাদের মূল গন্তব্যে পৌঁছানোর যাত্রা। আমাদের শেষটা যেনো “সুখ ও শান্তি” বিহীন না হয়। আল্লাহ আমাদের কল্যাণ করুণ।

২) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“তোমাদের কেউ তার কর্মের দ্বারা মুক্তি পাবে না।” সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও না? তিনি বললেন, “না, আমিও না। যদি না আল্লাহ আমার প্রতি রহম করেন। এরপর তিনি বলেন, “ঠিক পথ অবলম্বন কর, আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর এবং প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রির শেষ ভাগে ইবাদত করো, সংযম ও মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তবেই গন্তব্য স্থানে পৌছাবে।

(সহিহ বুখারী শরীফ)

এই হাদীসটি আমাদের শেখায় যে, মানুষের জীবনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি কোনো বস্তুগত অর্জন বা কর্মফলের মধ্যে নয়। বরং আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টিতে নিহিত। আমরা যতই ইবাদত বন্দেগী ও ভালো কাজ করিনা কেনো, যদি আল্লাহর দয়া না থাকে হৃদয়ে সত্যিকারের প্রশান্তি আসে না ও সফল হওয়া যায় না। অতএব আল্লাহর রহমতই সুখ ও শান্তির একমাত্র উৎস।

এ হাদীসটি আমাদের শিক্ষা দেয়, নিজের আমল বা যোগ্যতায় অহংকার ও কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে সঠিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিমিত পথ অনুসরণ করতে।

যে ব্যক্তি ভাবতে থাকে, “আমি নিজের আমলে সুখী বা সফল”, সে প্রকৃতপক্ষে আত্মতুষ্টিতে ভোগে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। আত্মতুষ্টি বলতে বোঝায়, নিজের ব্যাপারে অতিরিক্ত সন্তুষ্ট হয়ে ভুল বা ঘাটতি বোঝার ক্ষমতা হারানো। বিনয়, আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতাই প্রকৃত মানসিক শান্তি আনে।

নবী করীম ﷺ আমাদের সংযম ও মধ্যপন্থার আহ্বান জানান, অর্থাৎ সুখ ও শান্তির জন্য অতিরিক্ত ভোগবিলাস কিংবা অতিরিক্ত কষ্ট উভয়ই কাম্য নয়। মধ্যপন্থী জীবনযাপনই আত্মিক প্রশান্তি ও পার্থিব শান্তির মূল চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি সত্য, ন্যায়, ইবাদত ও আল্লাহভীতির পথে চলে, তার অন্তরে জন্ম নেয় এক প্রকার আত্মিক সুখ, যা বাহ্যিক নয়, বরং আল্লাহর স্মরণ, নামাজ, দোয়া ও ন্যায়পরায়ণ জীবন থেকে উদ্ভূত। যে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, সে দুনিয়াতেও শান্তি অনুভব করে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ পায়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিই মানুষের জীবনের সত্যিকারের সুখের পরিণতি।

৩) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

“সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে স্বলাতের মধ্যে।”

(সুনান নাসাঈ, হাদিস: ৩৯৪০)

এই গভীরতাপূর্ণ হাদিসে প্রকৃত সুখ শান্তির উৎসকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও দুনিয়ার বৈধ সৌন্দর্যকে কখনোই অস্বীকার করে না। বরং এগুলোকে জীবনের প্রশান্তি ও কল্যাণের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে স্থায়ী ও সত্যিকারের শান্তি শুধুমাত্র ইবাদতের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। যার সর্বোচ্চ প্রকাশ স্বলাত। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

“যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।”
(সূরা রা‘দ : ২৮)।

অর্থাৎ দুনিয়ার বৈধ সুখসমূহ মানুষকে মানসিক স্বস্তি দিলেও হৃদয়ের গভীর প্রশান্তি আসে আল্লাহর নৈকট্যে, স্বলাতের খুশু-খুজুতে। তাই এই হাদিস আমাদের শেখায় ইবাদতের সমন্বয়েই মানুষ প্রকৃত সুখ, প্রশান্তি ও জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বলাতের সময় হলে বিলাল (রা.)-কে বলতেন, হে বিলাল! আজান দাও, আমাদের সালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করো।

(আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৮৬)

ইসলামের সাথে জড়িত সকল কাজেই মুমিনদের জন্য রয়েছে প্রশান্তি। ইসলাম মানেই শান্তির ধর্ম। যে সদা সর্বদা সর্বক্ষেত্রে
শোভাস ছড়ায়।

৪) আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে দুনিয়ায় আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়েছে। বলা হবে, তোমরা (ফেরেশতারা) একে জাহান্নামে একটি চুবান দাও। অতএব তাকে জাহান্নামে একটি চুবান দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে অমুক! তুমি কি কখনো সুখের ছোঁয়া পেয়েছ? সে বলবে, না, আমি কখনো সুখের ছোঁয়া পাইনি। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে,

যে দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে জীবন কাটিয়েছে। বলা হবে, একে একটু জান্নাত দেখাও। অতঃপর তাকে জান্নাত দেখানো হবে। এরপর তাকে বলা হবে, হে অমুক! তোমাকে কি কখনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ স্পর্শ করেছে? সে বলবে, আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪৩২১)

এই হাদিস আলোকে বলা যায়, প্রকৃত সুখ ও শান্তি কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশে নয়। বরং দুনিয়াবি জীবনের ছোট্ট সফরে সকল দুঃখ কষ্ট কে আল্লাহর পথে ধৈর্য, ত্যাগ এবং ঈমানের মাধ্যমে সবর করে জয় করে নিতে হয়। মুমিনদের জন্য দুনিয়াবি এই কষ্ট কিছুই নয়। কারণ তারা ভালোভাবেই অবগত আছেন তাদের জন্য মহা প্রতিপালকের তরফ থেকে কত বড় নিয়ামত অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য। আল্লাহর আদেশে জান্নাত প্রাপ্ত একজন মুমিন , যে দুনিয়া তে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে যখন জান্নাতের সম্মুখীন হবে তার দুনিয়াবী জীবনের সকল দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে যাবে।

অপরদিকে, কিয়ামতের দিনে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শুধুই আনন্দ ও আরামে কাটিয়েছে, তাকে যখন জাহান্নামে দণ্ড দেওয়া হবে, তখন জাহান্নাম দেখে তার মনে হবে সে কখনোই সুখের ছোঁয়া পায়নি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এমন পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করুন। এখান থেকে এটা স্পষ্ট যে তা
দুনিয়াবী জীবনে সে সাময়িক আনন্দে ছিল, কিন্তু তা তাকে সত্যিকারের সুখ দিতে ব্যর্থ।

প্রকৃত সুখ হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ধৈর্যশীলতা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জিত শান্তি, যা চিরস্থায়ী এবং দুনিয়ার সাময়িক আনন্দের চেয়ে অনেক বড়। তাই আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট এলে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং ঈমানের পথে চলা হলো প্রকৃত সুখের মূল চাবিকাঠি।

৫) আনাস (রা.) বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) বের হয়ে পরিখা খননের স্থানে উপস্থিত হন। আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করেছিলেন। তাঁদের কোনো গোলাম বা ক্রীতদাস ছিল না যে তাঁরা তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। ঠিক এমনি সময়ে নবী (সা.) তাঁদের মাঝে উপস্থিত হলেন। তাঁদের অনাহারক্লিষ্টতা ও কষ্ট দেখে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের সুখ শান্তিই প্রকৃত সুখ শান্তি। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। সাহাবিগণ এর জবাবে বলেন, ‘আমরা সেসব লোক, যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, যত দিন আমরা জীবিত থাকি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামের জন্য।’ (বুখারি, হাদিস : ৪০৯৯)

এ হাদিসের আলোকে বলা যায়, প্রকৃত সুখ ও শান্তি দুনিয়ার আরাম-আয়েশে নয়, বরং আল্লাহর পথে ধৈর্য, ত্যাগ এবং ঈমানের মধ্যে নিহিত। এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর পথে ধৈর্য ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত শান্তি ও আনন্দই চিরস্থায়ী এবং প্রকৃত সুখের উৎস, যা দুনিয়ার সাময়িক আরাম ও সুবিধার চেয়ে অনেক মহান।

৬) হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো সেই কাজ, যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমানে কম হয়।

(সহিহ বুখারী)

এ হাদীসটির শিক্ষা প্রকৃত সুখ শান্তির ধারণার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। কারণ মানুষের হৃদয়ের প্রশান্তি আসে ধারাবাহিক সৎকর্ম ও ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে। ছোট হলেও নিয়মিত নেক আমল আল্লাহ তায়ালা'র অত্যন্ত প্রিয়। কারন আমলটা নিয়মিত করা হয়। আর এই ধরনের আমল যা পরিমানে কম কিন্তু নিয়মিত করা হয় তা আমাদের নৈকট্য বৃদ্ধি করে, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং জীবনে সুশৃঙ্খলতা বয়ে আনে।

অনিয়মিত বড় কাজের চেয়ে অল্প কিন্তু স্থায়ী ইবাদত মানুষের জীবনে এক ধরণের আধ্যাত্মিক ছন্দ সৃষ্টি করে। যা চাপ কমায়, মনকে হালকা রাখে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার পথে নিয়ে যায়। ফলে এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, প্রকৃত সুখ ও শান্তি বড় অর্জনে নয়, বরং নিয়মিত সৎকর্মের অভ্যাসে নিহিত।

৭) হাদীসে এসেছে: আবু সায়ীদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, উপস্থিত হে রব, সৌভাগ্য ও কল্যাণতো আপনারই হাতে। তারা বলবে, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না? আপনি আমাদের এমন নেওয়ামত ও সূখ-শান্তি দিয়েছেন যা কখনো অন্য কাউকে দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাদের এরচেয়ে উত্তম কোনো কিছু দেব? তখন তারা বলবে, হে প্রতিপালক! যা দিয়েছেন তার চেয়ে আবার উত্তম কোনো জিনিস আছে কী? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ থেকে আমার সন্তুষ্টি তোমাদের উপর স্থায়ী হয়ে গেল। আর কোনো দিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না"।(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮২৯)

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি লাভ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জান্নাতের প্রকৃত সুখ শান্তি দিবেন। কেননা, "জান্নাতেই রয়েছে প্রকৃত ও চিরস্থায়ী সুখ শান্তি।"

বাস্তব জীবনে প্রয়োগ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রকৃত সুখ শান্তির ধারণা আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। তবে এই জ্ঞান শুধু জানার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে তা কোনো ফলপ্রসূ পরিবর্তন আনতে পারবে না আমাদের জীবনে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শেখায়, প্রকৃত সুখ ও শান্তি অর্জনের জন্য ইসলামী আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

তবেই আমরা অন্তরের প্রশান্তি ও জীবনের প্রকৃত সুখ অনুভব করতে পারব। এজন্য আমাদের চারপাশে ইসলামিক পরিবেশ গড়ে তোলাটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা নিজেদের থেকে শুরু করাটা বেশি ফলপ্রসূ । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: পরিবার। তবে আমরা যদি আমাদের বাস্তব জীবনে কুরআন ও হাদিসের আলোকের এই প্রকৃত দিকগুলোকে কাজে লাগাতে না পারি এখানে ব্যর্থতা আমাদের নিজেদের।

পরিমাণে কম ইবাদত বন্দেগি বা ভালো কাজ দিয়ে হলেও আমরা আমাদের জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ শুরু করে দিতে পারি। আর এই দোয়া মহান প্রতিপালকের কাছে সর্বদাই জারি রাখতে পারি, "হে মহান প্রতিপালক, আমাদের হেদায়েত দান করুন ও মৃত্যুর আগে অব্দি হেদায়েতের পথে অটল রাখুন এবং হোক পরিমাণে কম তবে নিয়মিত নেক আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।"

নিচে কয়েকটি মাধ্যম দেওয়া হলো যেগুলো আমরা বাস্তব জীবনে নিয়মিত প্রয়োগ করার মাধ্যমে সফল হতে পারি।

১. দৈনন্দিন জীবনে ইবাদত

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত : কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যথাযথভাবে পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।

কালেমা মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান দৃঢ় করতে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত রাসূল" এ কথায় বিশ্বাসী হতে শেখায়। যা একজন মুসলিমের জন্য ইসলামে প্রবেশ করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এ বিশ্বাসে অবিশ্বাসে একজন মানুষ কখনো মুমিন হতে পারে না।

নামাজ যা পরিপূর্ণ মনোযোগের সহিত আদায় করা হয়; তা মানুষকে অশান্তি, অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে দূরে রাখে। রোজা আত্মসংযম, ধৈর্য ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। যাকাত সমাজে আর্থিক ভারসাম্য , ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। আর হজ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক।

ইসলামে আমরা এই শিক্ষা গুলোই পেয়ে থাকি। তবে এগুলোর বাস্তব ফলাফল নিজেদের জীবনে দেখতে চাইলে অবশ্যই ইবাদতে নিয়মিত হতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত করলে আল্লাহ আমাদের সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ করে দিবেন ইনশাআল্লহ।

তবে ইবাদতের পরিধি কেবল এই স্তম্ভেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম শিখিয়েছে যদি কোনো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে সেটিও ইবাদত। যেমন: পিতা-মাতার সেবা করা, সত্য কথা বলা, সদকা করা, পথ থেকে কষ্টদায় কোন বস্তু সরিয়ে দেওয়া, অন্যের উপকার করা, সময়মতো দায়িত্ব পালন, আমানতের খেয়ানত না করা এবং অন্যের হক নষ্ট না করা ইত্যাদিসমূহ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

দৈনন্দিন জীবনে এই ইবাদতগুলোর বাস্তব চর্চাই মানুষকে প্রকৃত সুখ ও মানসিক শান্তির পথে পরিচালিত করে।

২. ধৈর্য ও কষ্ট সহ্য

এই দুনিয়াবী জীবনটা হচ্ছে একটা পরীক্ষা কেন্দ্র। যেখানে আল্লাহ তাআলা আমাদের মানবজাতিদের পাঠিয়েছেন পরীক্ষার্থী হিসেবে। যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝার (দুঃখ-কষ্ট) মুখোমুখি হতে হবে। তবে ভয় পেয়ে বা পথভ্রষ্ট না হয়ে তাওয়াক্কুল রেখে ইবাদত বন্দেগীতে লেগে থাকতে হবে। দুনিয়ার জীবনের পথটাই এমন আঁকা বাঁকা। তাই মানুষ নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হবেই। তবে মুমিন কখনোই হতাশ হবে না বরং কষ্ট, দুঃখ ও বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করবে এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখবে এটাই ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কুরআনে আল্লাহ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।”
(সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩)

৩) ধৈর্যের বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় নবী ও সাহাবীদের জীবনেও :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অকল্পনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। তায়েফের পাথর, মক্কার নির্যাতন, পরিবার ও সাহাবীদের কষ্ট সবকিছুর মাঝেও তিনি কখনো ধৈর্য হারাননি। বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে শান্তি ও বিজয় অর্জন করেছেন।

হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ ভঙ্গ করার পর আল্লাহর হুকুম মোতাবেক পৃথিবীতে নেমে আসতে বাধ্য হন। যা ছিল তাঁর জন্য এক বিশাল পরীক্ষা। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তওবা করেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তাঁর এই ধৈর্য, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং দয়া বর্ষণ করেন।

হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে তার কওম কে আল্লাহর পথে ডাকলেন। কিন্তু তারা তাকে উপহাস করল, অবাধ্যের পথেই রইল। নৌকা নির্মাণের সময়ও তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করা হলো, কিন্তু তিনি তখনো ধৈর্য হারান নি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশে বন্যা এলে তিনি এবং ঈমানদাররা রক্ষা পেলেন। তাঁর ধৈর্য ও স্থিরতার ফলেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

হযরত আইয়ুব (আঃ) দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে অসুস্থতা, সম্পদহানি ও পরিবার হারানোর মতো কঠিন পরীক্ষায় থেকেও ধৈর্য হারাননি। তিনি তার পুরো অসুস্থতার সময় এই বলে দোয়া করেছেন :

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

এই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাঁকে আরোগ্য ও দ্বিগুণ বরকত দান করেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদের ষড়যন্ত্রে কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এছাড়া কূপে নিক্ষেপ হওয়া থেকে শুরু করে নানা বাধা বিপত্তি ও কষ্টের সম্মুখীন হন। দাসত্ব ও কারাবাসে থেকেও আল্লাহর প্রতি আস্থা হারাননি। তাঁর ধৈর্য ও সততার ফলেই মিসরের রাজকোষাধ্যক্ষ এবং পরবর্তীতে শাসক হন।

হযরত ইবরাহিম (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ, সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে কোরবানি করার নির্দেশের মতো পরীক্ষাতেও তিনি সফল হয়েছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে আগত সব পরীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ আনুগত্য ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে "খলিলুল্লাহ" (আল্লাহর বন্ধু) উপাধি দান করেন।

হযরত ইউনুস (আঃ) নবুওয়াতের দায়িত্ব থেকে অল্প সময়ের জন্য দূরে গেলে আল্লাহ তাঁকে মাছের পেটে নিক্ষেপ পরীক্ষা করেন। সেখানে তিনি আন্তরিক তাওবা ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করেন এবং আবার দাওয়াতের দায়িত্ব পান।
তিনি মাছের পেটে থাকাকালীন যে দোয়া বারবার জপে ছিলেন:

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

উপরোক্ত আলোচনায় সকল নবীর জীবনের জীবনীও আমাদের শেখায় ধৈর্য ও সহনশীলতা হলো প্রকৃত সুখ ও মানসিক শান্তির মূল চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি কষ্টে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রশান্তি দান করেন।

বিলাল (রাঃ) সে সাহাবী যিনি সর্বপ্রথম আযান দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। আবু বকর রা: তাকে ক্রয় করে দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করেন।ইসলাম গ্রহণের পর কঠোর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। গরম মরুভূমিতে ফেলে বুকে পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার। তবুও তিনি বলতেন: "আহাদ, আহাদ।" এই ধৈর্যের ফল হিসেবে আল্লাহ তাকে ঈমানের দৃঢ়তা এবং মহান মর্যাদা দান করেন। পরে তিনি হলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন যা তাঁর জন্য এক অনন্য সুখ ও সম্মানের দান।

খাব্বাব ইবন আরাত (রাঃ) ছিলেন উম্মে আন্মারের গোলাম। তার উপর যে জুলুম করা হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষেই ইসলামের ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম। আর এই নানাবিধ অত্যাচারের কারণ ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। সবচাইতে মর্মান্তিক জুলুম ছিল "জ্বলন্ত লোহার উপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের উপরে পাথর চাপ দেওয়া।" যার ফলে পিঠের চামড়া ও মাংস গলে লোহার আগুন নিভে গিয়েছিল। এমন নিষ্ঠুরতার পরেও তিনি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাননি। বরং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন।

উম্মে সালমা (রাঃ) ছিলেন ধৈর্যের এক মূর্ত প্রতীক। উহুদের যুদ্ধে তাঁর স্বামী শহীদ হন। ছোট ছোট সন্তান নিয়ে তার কঠিন সময় যাচ্ছিল। তিনি সবর করেছিলেন এবং এই কঠিন সময়ে

তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর শেখানো দোয়া পড়তে থাকেন এবং ফলাফল স্বরূপ আল্লাহ তাঁকে রাসুলুল্লাহ (স.)-কেই স্বামী হিসেবে দান করলেন। সুবহানাল্লহ।
দোয়াটি:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে মুসলিম কোনো মসিবতে পড়ে এই দোয়া পড়বে, আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন।' (সহিহ মুসলিম)

সাহাবীদের এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যারা অসংখ্য জটিল দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েও সবর ও ধৈর্যের মাধ্যমে সফলতার দেখা পেয়েছিল। তাদের শক্তি ছিলো আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও ইসলামিক মনোবল। যেখানে , সফলতাই গন্তব্য।

৫. সম্পর্ক ও সামাজিক শান্তি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْن َ

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।
— সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:১০

পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সদাচরণ, প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা, অন্যের হক সঠিকভাবে আদায় করা এসবই সামাজিক ইবাদতের অংশ। যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ ন্যায়, করুণা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রাখে, তখন সমাজে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নয়তো নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়া ও একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই সুসম্পর্ক ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।
এটি এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা ইবাদত, ধৈর্য ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সুখ ও শান্তি এনে দেয়।

আধুনিক সমাজে সুখের চ্যালেঞ্জ

বর্তমান যুগকে এককথায় অগ্রগতির যুগ বললে ও ভুল হবে না। কারণ বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ ও নানান দিক হতে সমৃদ্ধশীল এক যুগ। বর্তমানে নিত্যনতুন উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে বিশ্ব অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আর বিজ্ঞানের এই উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে ভোগবাদের ছোঁয়ায় মানুষ বস্তুগত উন্নতিতে অনেকটাই সফল আজকের এই দিনে। কিন্তু এর বিপরীতে মানসিক শান্তি ও আত্মিক সুখ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে মানবসমাজ। যা অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয়।

মানুষ শুধু বর্তমান সময়েই নয় বরং পৃথিবী বসবাসের যোগ্য হওয়ার পর থেকেই বাহ্যিক সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যস্ত ছিলো। তবে বর্তমানে এর পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে দিনদিন মানবীয় অন্তরে প্রশান্তি লাভ করাও অত্যন্ত জটিল হয়ে যাচ্ছে। আসলে দুনিয়ার কোন অর্জন'ই আমাদের প্রশান্তি এনে দিতে পারবে না, যদি তাতে ইসলাম না থাকে। আজকে মানুষ সুখ খুঁজছে সম্পদ, খ্যাতি, ভোগবিলাস ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের মাঝে। কিন্তু কুরআন আমাদের বলে :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"
— সূরা আর-রাদ, ১৩:২৮

বর্তমান সময়ে মানুষের অস্থিরতার মূল কারণ হলো দ্বীন থেকে বিচ্যুতি ও আখিরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরে যাওয়া। মানুষ যত বেশি বস্তুবাদী হচ্ছে, ততই তার জীবনে অশান্তি, একাকিত্ব, বিষন্নতা ও মানসিক শূন্যতা বাড়ছে। পরিবারের বন্ধন শিথিল হচ্ছে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি হারিয়ে যাচ্ছে, প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে তুলছে।

এছাড়া অনেকে তো ধরেই বসি দুনিয়াবি নানান অর্জনেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। তাই সে জিনিস অর্জনের জন্য জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করে দেই সেসব বস্তবাদী জিনিসের পিছনেই। একপর্যায়ে দেখা যায় এই দুনিয়া হতে প্রশান্তিবিহীন এক রূহ ও কৃতজ্ঞতা না নিয়েই পরপারে পাড়ি জমাতে হয়। তাই আমাদের সময়ের সঠিক ব্যবহার ও আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে তুষ্টি থাকতে হবে। সময়ের মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের জন্য সময় খুব সীমিত।

আধুনিক সমাজের নানা প্রলোভন ও ব্যস্ততা আমাদের দ্বীনের মূল শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে, সময় নষ্ট করতে পারে এবং অন্তরের সুখ ও শান্তি নষ্ট করতে পারে। তবে আমরা যদি সচেতনতা, সমঝোতা ও আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশি বেশি দোয়ার মাধ্যমে এই নেতিবাচক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করতে পারি। তাহলে আল্লাহর অশেষ রহমতে যেকোনো বিষয় সংশোধন করা সহজ হবে। এতে করে আধুনিক সমাজেও সুখ শান্তি র বীজ বপন সম্ভব।

ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক শান্তি

ইসলাম শুধুমাত্র পৃথিবীর একটি শান্তির ধর্মই নয়, পুরো বিশ্বব্যাপী একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা। যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, নৈতিকতা, দায়িত্ব ও অধিকারকে সুন্দরভাবে একত্রিত করে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآيِٕ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়, সৎকর্ম এবং আত্মীয়দের সাহায্যের আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করেন” (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০)।

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি সমাজ গঠন করা, যেখানে ন্যায়, ভ্রাতৃত্ব, করুণা এবং সহযোগিতা সবসময় বজায় থাকে। সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন সম্মান, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার পায়, সেটাই ইসলামের উদ্দেশ্য।

ইসলাম অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ধনী ও গরিবের মধ্যে যাকাত ও সদকার মাধ্যমে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য কমায়। পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব ও ভালোবাসা বজায় থাকে, ফলে পরিবার ও সমাজ শক্তিশালী হয়। এছাড়াও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে অপরাধ ও অন্যায়ের মাত্রা কমে আসে, যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে, তা তার ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসে” (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)।

এই হাদিস অনুসারে যদি মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে হিংসা, অবিচার ও বিশৃঙ্খলা দূর হবে এবং সমাজে প্রকৃত শান্তি বিরাজমান থাকবে।
অতএব ইসলাম মানুষকে শেখায় শুধু ব্যক্তিগত শান্তি অর্জনের জন্য ক্ষান্ত হলেই হবে না। সর্বদা চেষ্টা করব সমাজেও শান্তি প্রতিষ্ঠা, ন্যায় এবং সমতা নিশ্চিত করার। এটাও আমাদের দায়িত্ব। একজন ব্যক্তির উপর সমাজের ও অনেক প্রভাব পড়ে। তাই এর সংস্কার ও আমাদের ই করতে হবে। আমাদের শান্তিপূর্ণ ধর্ম ইসলাম শুধু নৈতিক শিক্ষাই নয় বরং পরিপূর্ণ ইসলামিক জীবনব্যবস্থা’ই আমাদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে আমাদের মাঝে তুলে ধরেন।

উপসংহার

মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভেই অর্জিত হয়। কোনো পার্থিব অর্জনে নয়। আল্লাহর স্মরণ, ধৈর্য, ইবাদত ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত সুখ শান্তি। কুরআন ও হাদিস নির্দেশ করে যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে আত্মার প্রশান্তি, পরিবারিক সুশৃঙ্খলতা ও সামাজিক শান্তি নিশ্চিত হয়। নবীগণ ও সাহাবীদের উদাহরণ প্রমাণ করে ধৈর্য, ত্যাগ ও সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয়। আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ বস্তুবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হলো ইসলামী নৈতিকতা অনুসরণ। অতএব, প্রকৃত সুখ ও শান্তি অর্জন সম্ভব শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশিত জীবনব্যবস্থার মধ্যে।

তথ্যসূত্র :

কুরআন মাজিদ। (n.d.). সুরা আত-ত্বীন, আয়াত ৯:৪. আল কুরআন;বায়ান ফাউন্ডেশন / কুরআন মাজিদ। (n.d.). সুরা রা'দ, আয়াত ১৩:২৮. আল কুরআন;বায়ান ফাউন্ডেশন / বুখারি, মুসলিম।সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮২৯/ খান ফারহাদ (২০২৪) পরিবর্তিত ধারণার উৎস / মুসলিম / সূরা রা'দ : ২৮/ সূরা ত্বহা, ২০:১২৪/সূরা নাহল, ১৬:৯৭/সুরা আন-নিসা ৪:৭৭/ আনফাল, আয়াত : ২৮/ইউসুফ, আয়াত ১২ : ১০৯/আন নাযিয়াত আয়াত: ৪০-৪১/আল হুজুরাত আয়াত: ১৩/ইউনুস (আয়াত: ৬২-৬৩)/আল-যুমার (আয়াত: ৭৩)/আল আ'রাফ (আয়াত: ১৫৬)/আল-আনফাল (আয়াত: ২৯)/মুসলিম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৬৫৬, তিরমিযী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৮৯/তিরমিযী,ইসলামিক ফাউন্ডেশন৩৪৪৫/সুরা : সাবা, আয়াত ৩৪ : ৩৭/সূরা আনকাবুত: ৬৪/সূরা ফুসসিলাত: ৪৬/সহিহ বুখারী শরীফ/সুনান নাসাঈ, হাদিস: ৩৯৪০/সূরা রা'দ : ২৮/আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৮৬/ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪৩২১/বুখারি, হাদিস : ৪০৯৯/সহিহ বুখারী/সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩/সহিহ মুসলিম/সূরা আল-হুজরাত, ৪৯:১০/সূরা আর-রাদ, ১৩:২৮/সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০/সহিহ বুখারী ও মুসলিম।